একাদশ অধ্যায়

যে গল্পের শেষ নেই

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

তখন আমি ক্লাশ সিক্স বা সেভেনে পড়ি। কত প্রশ্ন সব কিছু নিয়ে, সমাজ নিয়ে, পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে। বিশেষ করে নিজের উৎপত্তি নিয়ে তো এন্তার সব প্রশ্ন করে বিরক্ত করে চলেছি চারপাশের সবাইকে। ঠিক সে সময়েই আমার মামা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'যে গল্পের শেষ নেই' বইটি কিনে এনে দিলেন পড়ার জন্য। একটা ছোট বই একজনের জীবনে যে কি প্রভাব ফেলতে পারে তার প্রমাণ এই বইটা। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে প্রথম জেনেছিলাম সেখানেই। কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয় এই বইটি থেকে আমি হয়তো আরও বড় কিছু শিখেছিলাম - চারদিকের পৃথিবীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে শেখার হাতে খড়ি বোধ হয় হয়েছিল সেখানেই। তাই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বইটাকে স্মরণ করেই আমার এই বিবর্তনের উপর বইটা শেষ করছি, এই শেষ অধ্যায়টির নাম রাখছি 'যে গল্পের শেষ নেই'। আসলেই তো অন্তহীন এই গল্প - সেই সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে গেছে এই প্রাণের সমারোহ, হাজারো প্রজাতির ভীরে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে এই ধরণী, তাদের অনেকেই আবার টিকে থাকার খেলায় হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, উৎপত্তি-বিলুপ্তির এক অনন্ত খেলায় মেতে আছে যেন এই প্রকৃতি।

বই এর এই শেষ অধ্যায়টা যখন লিখতে বসেছি তখনই দেখলাম ফসিলবিদ এবং জীববিদদের মধ্যে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেছে নতুন এক আবিষ্কার নিয়ে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, লুসির ফসিল যদি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হয়ে থাকে, তবে ৩৩ লক্ষ বছর আগের এই তিন বছর বয়সী বাচ্চার প্রায় সম্পুর্ণ ফসিলটা একুশ শতকের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার। ফসিলটা পাওয়া গেছে ইথিওপিয়ার প্রত্যন্ত দিকিকা অঞ্চলে, লুসির ফসিল যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার খুবই কাছাকাছি জায়গায়। এই শিশুটি লুসির প্রজাতিরই *(Australopithecus afarensis)* অন্তর্ভুক্ত, তাই অনেকেই তাকে আদর করে নাম দিয়েছেন 'লুসির সন্তান'[৩]। ফসিলটার যে শুধু একটা পুর্নাংগ চেহারাই রয়েছে তাই নয়, তার দুধের দাঁতগুলো, পায়ের হাড়, এমনকি আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত ফসিলে পরিণত হয়েছে [২]। কোন বাচ্চার তো দূরের কথা, পূর্ণাংগ মানুষের এত পুরনো এবং সম্পূর্ণ ফসিল আগে কখনও পাওয়া যায়নি। আমরা মানুষের বিবর্তন নিয়ে লেখা অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে বিজ্ঞানীরা লুসিসহ এই প্রজাতির বহু ফসিলই খুঁজে পেয়েছেন। এই আবিষ্কারটির মাধ্যমে এখন বিজ্ঞানীরা মানুষের বিবর্তনের সেই ঊষালগ্নে এই প্রজাতির সন্তানপ্রসব, লালনপালন, শৈশব, বড় হওয়া সহ তাদের জীবনযাত্রার ছবিটা আরও সম্পূর্ণভাবে আঁকতে পারবেন। এ তো শুধু একটা *Australopithecus* শিশুর জীবনের কোন এক মুহুর্তের ছবি নয়, এই ফসিলটা যেনো বিলুপ্তির অতলে হারিয়ে যাওয়া আমাদের এই পূর্বপুরুষ প্রজাতির জীবন প্রবাহকে ছবির ফ্রেমে বেঁধে দিয়েছে।

ভালোই হল 'লুসির সন্তান' এর ফসিলের খবরটা পেয়ে, মানব বিবর্তনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা বাকি ছিল তা একটু হলেও সহজ হয়ে গেল। 'আমাদের গল্প' অধ্যায়ের শেষে বলেছিলাম, মানুষের সামাজিক গঠন, ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে শেষ অধ্যায়ে আরেকটু

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। মানুষের বিবর্তনে এগুলো যেরকম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে তা হয়তো অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য নয়। আর সেখানেই কি আমাদের প্রজাতির অনন্যতার রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে? এ প্রশ্নটির দেওয়ার আগে বোধ হয় তার আগের প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। বিপুল এই প্রাণীজগতে আমরা কি আসলেই অনন্য? এর উত্তর তো সোজাসাপ্টা 'হ্যা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ এই প্রকৃতিরই অংশ, অন্যান্য প্রাণীর মতই লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃর্তিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়ই তার উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াতেই মানুষের মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে যা প্রকৃতিতে আগে কখনও ঘটতে দেখা যায়নি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে কি ধরণের অভিনব এবং জটিল বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটতে পারে তা আমরা আগেই দেখেছি। মানুষের বুদ্ধিমত্তার এই অনন্য স্বকীয়তা যেন তারই আরেক বিশেষ সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আমাদের সামনে। বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার (তিনি এমআইটি র মস্তিষ্ক এবং বৌদ্ধিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তার সাথে বিবর্তনবাদের সম্পর্ক, মানুষের মন, সচেতন জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত) এক সাক্ষাৎকারে মজা করে বলেছিলেন, 'হুট করে দেখলে মানুষের বিবর্তনকে তো অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে পদ্ধতি থেকে শামুক, বট গাছ বা মাছের মত জীবের জন্ম হয় তা থেকেই কি করে আবার চাঁদে পৌঁছে যাওয়া, মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা ইন্টারনেটের জন্মদাতা এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণীর উৎপত্তি ঘটতে পারে? তাহলে কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শ আমাদের মস্তিষ্ককে বিশেষভাবে তৈরি করেছিল? না, আমি তা মনে করি না, কারণ ডারউনের দেওয়া প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়েই মানুষের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।' [১]

লুসির প্রজাতির অন্যান্য ফসিলের মতই এই দিকিকা শিশুরও কোমড় থেকে নীচে দ্বীপদী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু উপরের সব বৈশিষ্ট্যগুলোই তখনও বনমানুষের মতই রয়ে গেছে। এখান থেকে এবং অন্যান্য আদি মানুষ প্রজাতির ফসিল থেকে বোঝা যায় যে, আমরা আজকে আধুনিক মানুষের যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি তা একদিনে দেখা দেয়নি। পরিষ্কারভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন এখানে প্রথমে দ্বিপদী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোমড়ের নীচের অংশের এবং পায়ের গঠনের বিবর্তনকে নির্বাচন করেছে। তারপর ধাপে ধাপে অন্যান্য পরিবর্তনগুলো ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছরের পরিক্রমায়।[২] ব্যাপারটা এমন নয় যে, একটা কোন বিবর্তনের বোতাম টিপে দিলাম বা ম্যাজিকের মত একটা মিউটেশন ঘটে গেল আর আমরা রাতারাতি দুপায়ে ভর করে দাড়িয়ে গেলাম কিংবা কথা বলার শক্তি পেয়ে গেলাম। প্রাকৃতিক নিয়মে চলা বিবর্তন কখনই এভাবে ঘটে না। ঠিক একইভাবে বলা যায় যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা মস্তিষ্কের বিবর্তনও ঘটেছিল ধাপে ধাপে বহুকাল ধরে। আসলে শুধু তো মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধিই এখানে একমাত্র নিয়ামক হিসেবে কাজ করেনি। মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের পিছনে কাজ করে চলেছে মস্তিষ্কের ভিতরের লক্ষ কোটি স্নায়ু কোষ, তাদের বিশেষ গঠন ও জটিল সমন্বয়। কয়েকশ কোটি স্নায়বিক কোষের সাথে সাথে উন্মেষ ঘটেছে কয়েক হাজার কোটি স্নায়বিক জালিকা দিয়ে তৈরি স্নায়ুতন্ত্রের।[১] প্রায় ৫ লক্ষ বছর ধরে আমরা মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির যে ফসিল রেকর্ডগুলো পাচ্ছি তাতে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরও ধীর এবং ক্রমান্বয়িক বিকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শারীরিকভাবে আধুনিক মানুষের কাছাকাছি প্রজাতির উদ্ভব প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে ঘটলেও বৌদ্ধিকভাবে আধুনিক মানুষের বিবর্তন কিন্তু খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। মানব সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সূচনা হয়েছে এই তো সেদিন, তারপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যেতে যেতে এসে পৌঁছেছে আজকের স্তরে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কিছুই হঠাৎ করে একদিনে টুপ করে আকাশ থেকে পড়েনি। আজকে আমরা যে অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা দেখে অভিভুত হই তার উৎপত্তি এবং বিকাশ বহু লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের

ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে ধাপে ধাপেই ঘটেছে।

দিকিকা শিশুর ফসিলটিতে এক অভাবনীয় কান্ড ঘটেছে। তার মাথার খুলির ভিতরের মস্তিষ্কের নরম অংশগুলো পর্যন্ত পাথরের বুকে ফসিলীভুত হয়ে গেছে। তার মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান থেকে বিজ্ঞানীরা অভুতপূর্ব সব তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনের স্তরগুলো বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখান থেকেই তারা বুঝতে পারবেন প্রথম কখন মানুষের মস্তিষ্ক বড় হতে শুরু করেছিল এবং তা কিভাবে তাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছিল। আসলে মস্তিষ্কের এই আকার বৃদ্ধির সাথে মানুষের সামগ্রিক বিকাশের এত কিছু জড়িয়ে আছে যে তা নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এর ফলে মানুষ যে শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তাইই নয়, মায়ের সন্তান প্রসব, লালন পালন, পুরুষ ও নারীর জোড় বাঁধা থেকে শুরু করে সামগ্রিক সামাজিক অবকাঠামোতে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশ লাখ বছর আগে *H. erectus* দের মধ্যেই মস্তিষ্কের আকার বেশ বড় (প্রায় ১০০০ সিসি) হয়ে যেতে দেখা যায়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রজাতির মায়েরা এত বড় মস্তিষ্কের শিশুর জন্মদান করতো কিভাবে? তাদের কোমর বা পেলভিক অঞ্চলের যে গঠন তা দিয়ে তো এত বড় মস্তিষ্কসম্পন্ন শিশুর তো জন্ম দেওয়া সম্ভব নয় (ঠিক যেমন আমাদের প্রজাতির পক্ষেও তা সম্ভব নয়)! অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কোন এক সময় নিশ্চিয়ই সন্তান ধারণ, সন্তান প্রসব, এবং তাদের লালন পালনের প্রক্রিয়ায় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছিল[২]।

মানুষের শিশু অপরিণত অবস্থায় জন্ম লাভ করে, জন্মের সময় তার মস্তিষ্কের আকার যা থাকে তা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হতে প্রায় ৩ গুণ বড় হয়, জন্মের পর প্রথম বছরেই তা বেড়ে দ্বিগুন হয়ে যায়। একটা শিম্পাজি শিশু জন্মের সময় যেটুকু চলাফেরার ক্ষমতা এবং স্বনির্ভরতা নিয়ে জন্মায় তা মানব শিশুতে দেখা যায় জন্মেরও ১৭ মাস পরে [৪]। মানুষের শিশু যদি আরও পরিণত হয়ে জন্মাতো তাহলে গর্ভাবস্থায়তার মাথার আকারও আরও বড় হত। মায়ের পক্ষে দ্বিপদী গঠন নিয়ে সেই বড় মাথাওয়ালা শিশুর জন্ম দেওয়া সম্ভব হত না [৫]। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম, বিবর্তনের ধারায় কোন এক সময়ে যদি এই অপরিণত শিশুর জন্মের ব্যাপারটা নির্বাচিত না হত তাহলে মানুষের মস্তিষ্কও পরে এত বড় হওয়ার সুযোগ পেত না। আসলে এই পরিবর্তনটির ফলেই পরবর্তী কয়েক লক্ষ বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের মস্তিষ্কের আকার দ্বিগুণ হতে পেরেছে। এই তিন বছর বয়সী দিকিকা শিশুর মস্তিস্কের আকার থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই বয়স পর্যন্ত তার মস্তিষ্কের ক্রমবৃদ্ধি শিম্পাঞ্জির থেকে ধীর গতিতে ঘটেছে। তাহলে খুব অল্প হলেও সেই ৩০-৪০ লাখ বছর আগেই তাদের শৈশব প্রলম্বিত হতে শুরু হয়ে গিয়েছিল[২]। এদিকে আবার সম্পুর্নভাবে দ্বিপদী হওয়ার ফলে তাদের হাত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং মায়েরা এই অপরিণত শিশুকে দুই হাত দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে যত্ন নিতে পেরেছে। তাই দেখা যায়, একসময় মানব শিশু বনমানুষের শিশুদের মত জন্মের পরেই মায়ের পিঠ আঁকড়ে ধরে রাখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। ফসিলবিদেরা এখনও দিকিকা শিশুর পায়ের আঙ্গুলগুলোকে শিলাস্তর থেকে আলাদা করে উঠতে পারেন নি। তারা আশা করছেন এর পায়ের আঙ্গুলের গঠন থেকেই বোঝা যাবে যে, লুসির প্রজাতির সময় থেকেই শিশুরা মাকে আঁকড়ে ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল নাকি তা আরও পরের কোন প্রজাতিতে ঘটেছিল [২]।

এ তো না হয় গেলো শারীরিক বিবর্তনের অংশটি, চলুন এখন দেখা যাক এই আপরিণত শিশুর জন্ম দেওয়ার ফলে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে কি বিশাল প্রভাব পড়েছিল! অপরিণত শিশুকে বড় করার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন, বাবা মার আরও বেশী সময় দিতে হয় তাকে বড় করে তুলতে। অনেকে মনে করেন যে, সন্তানের এই বিশেষ লালন পালন পদ্ধতির সাথে মানুষের জোড়া

বাঁধা এবং সামাজবদ্ধ হওয়ার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মেয়েরা বেশী সময় ঘরে থেকে সন্তান লালন পালন শুরু করে, পুরুষেরা খাওয়া সংগ্রহ করে ঘরে ফেরে। দ্বিপদী হওয়ার ফলে তাদের হাত দু'টো স্বাধীন, তারা বাড়তি খাওয়া হাতে করে নিয়ে আসতে পারে। একজন পুরুষ একজন মেয়ের সাথে দীর্ঘ মেয়াদি সময় ধরে জোড়া বাঁধার ফলে তাদের যৌন সম্পর্কের নিশ্চয়তাও যেমন থাকে আবার অপরিণত শিশুর দেখাশোনার মাধ্যমে তাকে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। এদিকে মাংস খেতে শুরু করার পর তাদের আর অরন্যের বা গাছগাছালির উপরও নির্ভর করতে হয় না। তারা যে কোন জায়গায় বসতি স্থাপন করে দুর দুরান্ত থেকে খাওয়া সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারে। হাতিয়ারের ব্যবহারও কিন্তু এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। বিজ্ঞানীরা ২০ লক্ষ বছরেরও বেশী পুরনো ফসিলের সাথে বিভিন্ন ধরনের সরল হাতিয়ায়ের সন্ধান পেয়েছেন। এইসব জায়গায় ফসিলীভুত বিভিন্ন জিনিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরা তখন শিকার করতে শুরু করেছিল। এই সরল হাতিয়ারগুলোর উন্নতি ঘটতে দেখা যায় ১৫-১৭ লক্ষ বছর আগে *H. erectus* প্রজাতির মধ্যে। তবে এই হাতিয়ারগুলোর গঠনে লক্ষ্যনীয় রকমের গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় দুই লক্ষ বছর আগে। এদের বিশেষ রকমের ধারালো গঠন দেখে বোঝা যায় যে, এ সময়ে নিশ্চয়ই মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশে এক বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। তারা পরিকল্পণা, কার্যকরন এবং তার প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেছিল, কিভাবে হাতিয়ারগুলো বানালে তা দিয়ে নির্দষ্ট কর্ম সম্পাদন করা যাবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল।

অন্যান্য প্রাইমেটদের তুলনায় মানুষের খাদ্য ভাগাভাগি করে খাওয়ার অভ্যাসটা কিন্তু বেশ অন্যরকম। মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী যে খাওয়া সংগ্রহ করে নিজে না খেয়ে তার পরিবার বা দলের কাছে পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সমাজবদ্ধতা এখানে তাকে টিকে থাকার জন্য হাজারো রকমের বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। বিপদে আপদে তারা একসাথে হয়ে যুদ্ধ করে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, হিংস্র বন্য জন্তু শিকার করতে পারে, বেশী করে খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, সন্তান লালন পালনে সুবিধা হয়। এদিকে আগুনের ব্যবহার শেখাটা বোধ হয় মানব ইতিহাসের এক বিশেষ মাইলফলক। সে হিসেবে দেখলে আজকে নাসার মঙ্গল গ্রহে রকেট পাঠানোর চেয়ে একে কোন অংশেই ছোট আবিষ্কার বলা যায় না। আগুন দিয়ে একদিকে সে বিভিন্ন রকমের খাদ্য পুড়িয়ে বা রান্না করে খেতে শিখলো, রকমারী খাদ্যের বিস্তৃতিও বেড়ে গেল বহুগুণ। আবার আগুন দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে তারা অন্যান্য প্রাণীর হাত থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে শিখলো। তাদেরকে আর নিরাপত্তার জন্য আর রাতের বেলা গাছে গাছে থাকতে হচ্ছে না। আগুন জালিয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারার ফলে শুধুমাত্র গরম আবহাওয়ায় বাস করার প্রয়োজনও কমে আসলো, পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়তে আর বাধা রইলো না। মানুষের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে তারা বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকা থেকে বের হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তাদেরকে অভিযোজিত হতে হয়েছে, বেঁচে থাকার জন্য আবিষ্কার করতে হয়েছে নতুন নতুন পদ্ধতির। খুব সম্ভবত *Homo* প্রজাতিগুলোর উদ্ভবের পরই মানুষের মধ্যে এই বিশেষ অভ্যাসগুলো গড়ে উঠতে শুরু করে। ৫ লক্ষ বছরের পুরনো বিভিন্ন ফসিল রেকর্ডে মানুষের ঘর বাঁধা, সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা ইত্যাদির পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায়। আফ্রিকার কালাহারি মরুভুমিতে স্যান নামের যে প্রাচীন শিকারী উপজাতি রয়েছে তাদের মধ্যে এখনও এ ধরণের দল দেখতে পাওয়া যায় [৬]। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরণের বিভিন্ন অভ্যাস, ব্যবহার, সামাজিক ব্যবস্থাগুলো একদিনে গড়ে ওঠেনি। শারীরিক এবং বৌদ্ধিক বিবর্তনের সাথে সাথে এদেরও বিকাশ ঘটেছে ধীর গতিতে, একেক সময়ে, একেক ভাবে।

ভাষার উৎপত্তি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে তার বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক

এবং সামাজিক জীবনে এক অভিনব অধ্যায়ের সুচনা হয়েছে যা আর কোন প্রাণীর মধ্যে ঘটতে দেখা যায় না। অনেকেই মনে করেন যে ভাষার উৎপত্তিই মানুষের স্বকীয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। ঠিক কোন সময় ভাষার উৎপত্তি ঘটেছিল তা এখনও আমরা সঠিকভাবে জানি না। শব্দ, বাক্য কিংবা ভাষা তো আর ফসিলীভুত হয় না তাই তার বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। তবে বিজ্ঞানীরা কিছু জিনের সন্ধান পেয়েছেন যারা মানুষের কথা বলা, ভাষার সমন্বয় ইত্যাদিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। এই জিনগুলোর কাজ এবং উৎপত্তির সময়সীমা জানতে পারলে হয়তো আমরা সহজেই ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কেও আরও ভালো ধারণা পেতে সক্ষম হব। তবে ভাষার ব্যবহারের জন্য যে শুধু মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ বিকাশই দরকার তাইই নয়, গলার ভিতরও এক ধরণের বিশেষ গঠনের প্রয়োজন। শিম্পাঞ্জি বা বনমানুষের মধ্যে এই পরিবর্তনটি ঘটেনি, আর তাই তাদেরকে কিছু শব্দ শেখানো গেলেও তারা আমাদের মত ভাষার ব্যাপক ব্যবহার করতে সক্ষম নয়[৭]। আমাদের এই সদ্য পাওয়া দিকিকা শিশুর ফসিলটিতেও ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় গঠনটি দেখা যায় না [২]। অর্থাৎ, ভাষার জন্য যে মিউটেশন বা মিউটেশনগুলোর প্রয়োজন ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই বনমানুষদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার অনেক পরে ঘটেছে। তবে এটা বোধ হয় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আধুনিক প্রজাতির মানুষেরা ৫০-৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়ার আগেই তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির বিবর্তন ঘটেছিল[১]। কারণ আপনি পৃথিবীর যে কোন জায়গা বা জাতি থেকে কয়েকটি শিশুকে একেবারে ছোটবেলায় নিয়ে এসে বড় করলে দেখবেন যে তারা একই ভাষায় একই রকম উচ্চারণে কথা বলতে শিখছে, ভাষা শেখার ক্ষমতা তাদের একেবারেই একরকম।

বর্ণভেদ (racism) কি ন্যায়সংগত?

না। সাড়া পৃথিবী জুড়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে জাতভেদ, বর্ণভেদের ভিত্তিতে যে বৈষম্য তৈরি করে রাখা হয়েছে তা আসলে ভিত্তিহীন। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস বলছে আমরা সবাই একই প্রজাতি থেকে উদ্ভুত হয়ে মাত্র ৫০-৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে সাড়া পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছি। আমরা গায়ের রং, চুলের রং বা নাক মুখের গড়ণে যে বাহ্যিক পার্থক্য দেখি তা ভৌগলিকভাবে বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ফল। ভৌগলিকভাবে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব রয়েছে সেটা ঠিক কিন্তু বংশগতীয়ভাবে জাতি, বর্ণ বা Race এর ভেদাভেদ বলতে যা বোঝায় তা আমাদের প্রজাতির মধ্যে নেই। আমাদের জিন পুলে পার্থক্য এতই নগন্য এবং একজনের সাথে আরেকজনের জিনে পার্থক্য এতই কম যে কোন দল বা গোষ্ঠিকে আলাদা কোন জাত বা বর্ণে ভাগ করা যায় না। এ ছাড়া আমাদের প্রজাতির কোন দল বা গোষ্ঠীই প্রজননতভাবে একে অন্যের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় বিচ্ছিন্ন ছিল না যে তাদের থেকে নতুন উপ-প্রজাতি বা বর্ণের উৎপত্তি ঘটতে পারে[১]। আজকে যদি অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, নাজেরিয়া বা নরওয়ে, আমেরিকা বা পেরুর সদ্য জন্মানো শিশুকে একসাথে একইভাবে বড় করা হয় তাহলে তারা বাহ্যিকভাবে দেখতে কিছুটা অন্যরকম হলেও তাদের ভাষা, ব্যবহার (স্বাতন্ত্রতা বা প্রকারণের কারণে একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য দেখা যেতে পারে তার চেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যাবে না) সব কিছুই একইরকম হবে। পৃথিবীর কোন জাতির মানুষের মধ্যেই যৌন প্রজননেও কোন সমস্যা দেখা যায় না। এর সব কিছু থেকেই প্রমাণিত হয় যে আমরা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। ভেবে দেখুন তো, আমরা আমাদের সংকীর্ন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বর্ণভেদ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে সামাজিক বৈষম্য তৈরি করার চেষ্টা করি, কিন্তু আজকে যদি নিয়ান্ডারথাল প্রজাতি বা লুসিদের মত মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতিরা পৃথিবীতে টিকে থাকতো তাদেরকে আমরা কোন চোখে দেখতাম?

তবে স্টিভেন পিঙ্কারের মত অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে ভাষার মত জটিল একটা ব্যাপার একদিনে বিবর্তিত হয়নি, এর বিবর্তন ঘটতেও দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সম্ভবত মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তন, সামাজিক আদানপ্রদান, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে বৌদ্ধিক জ্ঞান এবং ভাষার উন্মেষের মত বৈশিষ্ট্যগুলো এক জটিল

প্রক্রিয়ার। এরা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, একটার হাত ধরে আরেকটা আরও উন্নত হয়েছে।

আমরা এখন সহজাতভাবেই কথা বলি, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, ভাষা মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে কি বিশাল ভুমিকা রেখেছে। ভাষার উৎপত্তির কারণেই আমরা ভাব বিনিময় করতে পারি, একজন আরেকজনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারি, অতীত প্রজন্মগুলো থেকে শেখা বিশাল জ্ঞানভান্ডারকে পরের প্রজন্মে সঞ্চালিত করতে পারি। শুধু তো তাই নয়, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারি, নিজেদের ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা করতে পারি, নিজেদের দল বা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গল্প, উপাখ্যান, ধর্মীয় বিধি নিষেধ তৈরি করতে পারি। লিখিত ভাষা আবিষ্কারের অনেক আগেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের অভিজ্ঞাতাকে ছড়িয়ে দিত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গল্প কথা কাহিনীর মাধ্যমে। মানুষের শৈশবকালও অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক দীর্ঘ, তার ফলে সে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে, সামাজিক আভিজ্ঞতাগুলো থেকে শিখতেও পারে অনেক বেশী। এদিকে আবার ভাষা এবং ভাব বিনিময়ের ব্যাপক বিকাশের ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের তথ্য বা স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষমতারও বিশেষ বিবর্তন ঘটেছে, আরও বড় এবং উন্নত হয়েছে মস্তিষ্ক। এর ফলশ্রুতিতেই মানুষের মধ্যে সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষমতা গড়ে ওঠে [৫]। গত প্রায় এক লক্ষ বছরে মানুষের তেমন কোন শারিরীক বিবর্তন না ঘটলেও সাস্কৃতিকভাবে সে এই পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসে এক সরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে।

পশুপালন এবং কৃষি এই সাংস্কৃতিক বিকাশকে উত্তরিত করেছে আরেক স্তরে। মাত্র ১০ হাজার বছর আগে কৃষির উদ্ভবের ফলেই প্রথমবারের মত মানুষ বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে। আর তার ফলশ্রুতিতেই মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে দ্রুত গতিতে, গড়ে উঠে স্থিতিশীল গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। সমাজের এক অংশ কৃষিকাজের মাধ্যমে বাড়তি খাদ্যের যোগান দিতে পারায় অন্যরা রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পকলা চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়, ধীরে ধীরে তৈরি হয় শহরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার। বাড়তি খাদ্যের কারণেই সামাজিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয়, গড়ে উঠতে শুরু করে জাত, ধর্ম, প্রথা এবং শ্রেনীর ভেদাভেদ। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত গড়ে ওঠে সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক বিকাশের যেন জোয়ার বয়ে যেতে শুরু করে পৃথিবী জুড়ে [৬]। রিচার্ড ডকিন্স থেকে শুরু করে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, মানব বিবর্তনের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একে বাদ দিয়ে মানুষের বিবর্তনের গল্প সম্পূর্ণ হতে পারে না। মস্তিষ্কসহ অন্যান্য শারীরিক বিবর্তন যেমন এই সাংস্কৃতিক বিকাশের সোপান হিসেবে কাজ করেছে তেমনি এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশও আমাদের সামগ্রিক বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে। গত তিরিশ বছরে মানুষের একটাই উল্লেখযোগ্য বিবর্তন ঘটেছে, তাদের হাড় এবং কঙ্কালের গঠন অনেক হাল্কা এবং সরু হয়ে গিয়েছে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে মানুষ যতই উন্নত ধরণের হাতিয়ার, প্রযুক্তি, এবং খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি শিখেছে ততই কমে এসেছে শারীরিকভাবে ভারী এবং চ্যালেঞ্জিং কাজের পরিমাণ, আর তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বিবর্তন ঘটেছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা গড়নের।

উপরে বলা বৈশিষ্ট্যগুলোই আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীদের থেকে। মানুষ ‘কারণ এবং ফলাফল’ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, আমরা আমাদের অতীত থেকে শিখতে পারি, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারি। আমরা প্রকৃতির উপর তো পুরোপুরি নির্ভরশীল নইই বরং সাধ্যমত প্রকৃতিকে বদলে নিতে পারি নিজেদের প্রয়োজনে। অন্যান্য প্রাণীরা প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিজেদের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইচ্ছে করলেই বদলাতে পারে না। তাদের নির্ভর করতে হয়

দীর্ঘ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আরও যোগ্যতর বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবর্তনের উপর। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। আমরাই একমাত্র প্রাণী যারা আমাদের পারিপার্শ্বিকতাকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে পারি, বদলে দিতে পারি, প্রয়োজনে ধ্বংসও করতে পারি। আমাদের শিশুদের জন্ম এবং টিকে থাকা অনেকটাই এখন আর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়।

সামাজিক ডারউইনবাদ আর প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদ কি এক?

না মোটেই তা নয়। ভিক্টোরিয়ান যুগে সামাজিক ডারউইনবাদের (Social Darwinism) উদ্ভব ঘটান হার্বার্ট স্পেনসার নামের এক দার্শনিক, যা ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তন তত্ত্ব থেকে একেবারেই আলাদা। স্পেন্সর ডারউইন কথিত জীবন সংগ্রাম (struggle for life)কে বিকৃত করে 'যোগ্যতমের বিজয়' (survival of fittest) শব্দগুচ্ছ সামাজিক জীবনে ব্যবহার করে বিবর্তনে একটি অপলাপমূলক ধারণার আমদানী করেন। স্পেনসারের দর্শনের মূল নির্যাসটি ছিল - 'might is right'। তিনি প্রচারণা চালান যে, গরীবদের উপর ধনীদের নিরন্তর শোষণ কিংবা শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের দর্প এগুলো নিতান্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই এগুলো ঘটছে, তাই এগুলোর সামাজিক প্রয়োগও যৌক্তিক। এ ধরনের বিভ্রান্তকারী দর্শনের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে বিভিন্ন শাষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্যকে বৈধতা দান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বিভিন্ন সময়। হিটলার তার নাৎসীবাদের সমর্থনে একে ব্যবহার করেন। ১৯৩০ সালে আমেরিকার ২৪ টি রাষ্ট্রে 'বন্ধ্যাকরণ আইন' পাশ করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল জনপুঞ্জে 'অনাকাঙ্খিত' এবং 'অনুপযুক্ত' দুর্বল পিতামাতার জিনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। অর্থাৎ 'সামাজিকভাবে ডারউইনবাদের প্রয়োগ'-এর মাধ্যমে 'যোগ্যতমের বিজয়' নানা ধরণের নৈরাজ্যজনক প্রতিক্রিয়শীলতার জন্ম দিয়েছিল, আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে অনেকে এখনও মুক্তি পায় নি। কিন্তু সত্যি বলতে কি- ডারউইন কখনওই এধরনের 'যোগ্যতমের বিজয়'-এর কথা বলেন নি, কিংবা তার প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে কখনই সামাজিকজীবনে প্রয়োগ করার কথা ভাবেননি। কাজেই এ ধরনের বর্ণবাদী তত্ত্বের সাথে ডারউইন বা তত্ত্বকে জড়ানো নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রকৃতিতে কিছু ঘটে বলেই তা সামাজিক জীবনেও প্রয়োগ করা উচিৎ - এ ধরণের চিন্তাধারা এক ধরনের কুযুক্তি বা হেত্বাভাস (fallacy)। হেত্বাভাসটির পুঁথিগত নাম হল - 'প্রকৃতির দোহাই' (Naturalistic fallacy)। প্রাকৃতিক নির্বাচন আসলে প্রকৃতিতে প্রজাতির প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকার কিংবা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথাই শুধু ব্যাখা করছে - সামাজিক জীবনে এর প্রয়োগের 'ঔচিত্য' নিয়ে কখনোই মাথা ঘামাচ্ছে না। প্রকৃতিতে কিছু ঘটার অর্থ এই নয় যে তা সামাজিকভাবেও প্রয়োগ করতে হবে। আর তা ছাড়া বিবর্তনবাদের মুল বিষয়বস্তু ভালো করে বুঝলে দেখা যায় যে এর সাথে স্পেনসারের দেওয়া মতবাদের কোন সম্পর্কই নেই। প্রকৃতিতে কেবল নিরন্তর প্রতিযোগিতাই চলছে না, বরং বিভিন্ন ধরণের পারস্পরিক সহযোগিতা, মিথোজীবীতা কিংবা সহ-বিবর্তনও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। জীবের টিকে থাকার জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ, সামাজিক বিবর্তনবাদে এই ব্যাপারগুলো অস্বীকার করে কেবল 'যোগ্যতমের বিজয়'-এর কথাই কেবল সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, বিবর্তন ঘটার জন্য প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের প্রকারণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। জনপুঞ্জে জেনেটিক প্রকারণ না থাকলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কাজই করতে পারবে না। কিন্তু সামাজিক ডারউইনবাদের প্রবক্তারা জোর করে 'অনাকাঙ্খিত' জিনকে হটিয়ে দিয়ে প্রকারণকে দূর করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। এ জন্য বহু আগেই 'সামাজিক ডারউইনবাদ' সচেতন বৈজ্ঞানিক মহাল থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। অনেকেই অজ্ঞতার কারণে এখনো ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে পরিত্যক্ত সামাজিক বিবর্তনবাদকে গুলিয়ে ফেলেন।

মানব পিতামাতারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কখন কয়টি শিশুর জন্ম হবে, কিভাবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা, খাদ্যাভ্যাস, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তারা টিকে থাকতে পারবে (যদিও তা আপনি অর্থনৈতিকভাবে কোন শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত তার উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল)। আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় আজকে আমরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারছি, বার্ধক্যের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের আয়ু বাড়িয়ে চলেছি,

জন্ম নিয়ন্ত্রন করছি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজন এমন সব প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিকাশ ঘটাচ্ছি, এমনকি নতুন নতুন প্রজাতির পর্যন্ত উদ্ভব ঘটাচ্ছি, বাকীদের এগিয়ে দিচ্ছি বিলুপ্তির পথে। একে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে টেক্কা দেওয়া ছাড়া আর কি বলবেন? গত কয়েকশ বছরে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের স্বার্থে প্রকৃতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে শুরু করেছি। পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী অংশগুলো বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে মারনাস্ত্র, জীবানু অস্ত্র, নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর খেলায় মেতে উঠলেও প্রকৃতিকে রক্ষা করার বিজ্ঞানটি নিয়ে কিন্তু তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমাদের বোঝা দরকার যে, মানুষের এই বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই আজ আমাদের উপর বর্তে গেছে আর এক গুরুদায়িত্ব। প্রকৃতিকে বদলে ফেলার ক্ষমতার পাশে পাশে নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও এসে পড়েছে আমাদেরই উপর। নিজেদের টিকে থাকার জন্য ক্রমাগতভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলে তো আমাদের ধ্বংসই অনিবার্য হয়ে উঠবে! ডঃ আর্নেষ্ট মায়ার তার 'Evolution' বইতে লিখছিলেন, মানুষের এই বৌদ্ধিক বিকাশ একদিকে যেমন তার গর্ব, আরেকদিকে সেটাই তার বোঝা। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় কথাটার তাৎপর্য কত গভীর।

আমরা আগেই দেখেছি, বিবর্তন তত্ত্বকে আলাদা করে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রেখে বিচার করলে এর সামগ্রিকতাকে বোঝা সম্ভব নয়। বিবর্তনবাদ আজকে শুধু একটা যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই নয়, এ আমাদের চিরায়ত চিন্তাভাবনা, দর্শন, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার খুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছে। মানুষের চৈতন্য এবং বৌদ্ধিক জগতে যেন বিপ্লবের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে এই মতবাদটি! মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার নিজেরই তৈরি কাল্পনিক সৃষ্টিতত্ত্বের ধোঁয়াজাল থেকে! তাই এর বিপক্ষে বিরোধিতার পরিমাণটাও যে তীব্র হবে তা তো সহজেই বোধগম্য! সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিবর্তনবাদের বা ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বটা খুব সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এর পিছনে রাজনৈতিক এবং সামাজিক যে শক্তিগুলো কাজ করে তা হয়তো অনেক সময় আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। প্রবল ক্ষমতাধারী মধ্যযুগীয় চার্চ্চ যখন ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারে আর গ্যালিলিওকে বলে কোপার্নিকাসীয় সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের কথা প্রচার করা যাবে না, তার সাথে আজকের ক্ষমতাধারী রক্ষণশীলদের (যেমন ধরুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ যখন বলে আইডিকে বিজ্ঞান হিসেবে পড়ানো উচিত) বিবর্তনবাদের তীব্র বিরোধিতার মিলটা কোথায় তা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলেই স্পষ্ট ওঠে। পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট হয়তো বদলেছে, ইচ্ছে করলেই হয়তো তারা আর বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারতে পারে না, কিন্তু শক্তিশালী অদৃশ্য হাতগুলো তখন যেভাবে কাজ করেছিল এখনও কিন্তু তারা একইভাবে কলকাঠি নেড়ে চলেছে। তাই হাজার হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের দ্বন্দ্বকে বুঝতে হলে কিংবা আজকের আমেরিকায় বিবর্তনবাদ বিরোধী রক্ষণশীল আইডি প্রবক্তাদের ক্ষমতা ঠিকমতভাবে বুঝতে হলে এর পিছনের সামগ্রিকতাকেও উপলব্ধি করা দরকার। আমরা জানি প্রাচীন গ্রীক দর্শন এবং রোমান সাম্রাজ্যের রাজনীতি কিভাবে খ্রীষ্ট ধর্মের উত্থান এবং বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে - ইতিহাস ঘেটে দেখলে অন্যান্য ধর্মগুলোর ক্ষেত্রেও একই রকমের ঘটনা দেখা যায়। বুদ্ধিমান মানব প্রজাতি সভ্যতার যে জটিল কাঠামো তৈরি করেছে তাকে তার সামগ্রিকতায় ফেলে বিচার করতে হবে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো কিভাবে ধর্ম এবং সৃষ্টিতত্ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তা গভীরভাবে বুঝতে হবে। তাহলেই আমরা বিবর্তনবাদ এবং সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতাকারী এই অন্ধ, ধর্মীয় রক্ষণশীল শক্তিশালী অংশটির বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থানে দাঁড়াতে পারবো।

অনেকেই মনে করেন মানুষকে কেন্দ্রে বসিয়ে প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী জীবন না চলালে নাকি মানব

সভ্যতার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে যাবে। বিবর্তনবাদ নাকি মানুষকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে! ব্যাপারটা যেনো এরকম যে ডারউইন বিবর্তনের তত্ত্ব দেওয়ার আগে পৃথিবীতে অনৈতিক ব্যাপারগুলোর অস্তিত ছিল না। মানুষের আর বেঁচে থাকার, ভালো কাজ করার কোন অনুপ্রেরণা থাকবে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে ঠিক তার উলটো নয়? অনেকেই আমাদের নিজেদের কল্পনায় বানানো এই 'সৃষ্টি'র মহত্ত্বকে ত্যাগ করতে ভয় পান - কিন্তু ভেবে দেখুন তো আজকে আমরা যতই নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারছি, যতই বুঝতে পারছি যে 'আমরা প্রকৃতিরই একটা অংশ মাত্র, কেউ আমাদেরকে বিশেষভাবে পরিকল্পনা করে বানায়নি, কেউ আমাদের সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই মহাবিশ্বকে সাজায়নি' ততই কি আমাদের চিন্তার পরিসর বিস্তৃত হচ্ছে না, দায়িত্বশীল হওয়ার দায় বেড়ে যাচ্ছে না? হয়তো সারাটা মহাবিশ্বই পড়ে রয়েছে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত পদচারণার অপেক্ষায় - হয়তো এরকম আরও মহাবিশ্বের পর মহাবিশ্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, হয়তো আমাদের মত জীবনের সমারোহে, প্রাণের স্পন্দনে মুখরিত হয়ে আছে আরও অনেক বিশ্ব! কিংবা কে জানে, হয়তো বা আমরা ছাড়া আর কোন বুদ্ধিমান প্রাণীরই উদ্ভব ঘটেনি অন্য কোথাও! অতিকায় ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেউ তো একবারও ফিরে তাকায়নি; কয়েকশো কোটি বছরের যাত্রাপথে আরও কোটি কোটি প্রজাতি বিলুপ্তির পথ ধরেছে, প্রকৃতি তো এক ফোটাও চোখের জল ফেলেনি; আমাদের প্রজাতিও হয়তো এক সময় হারিয়ে যেতে পারে প্রাকৃতিক নিয়মেই। কেউ তো আমাদেরকে রক্ষা করার পবিত্র দায় নিয়ে বসে নেই। আমাদের নিজের দায়িত্ব আজকে নিজেকেই নিতে হবে, নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এক সুস্হ মানব সমাজ গড়ে তুলতে হবে, নিজেদের বিলুপ্তি ঠেকাতেই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। নিজেদের অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তার আলোয় বলিষ্ঠ হয়ে 'রহস্যময়' এই 'প্রায় অচেনা' মহাবিশ্বের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আর কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে, এই টিকে থাকার, বিকশিত হওয়ার, ছড়িয়ে পড়ার প্রাণের মেলায় আমরাই আমাদের সাথী, কান্ডারী এবং ত্রাণকর্তা। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন স্টিফেন জে গুল্ড তার *Wonderful Life* (1989) বইটিতেঃ 'আমরা ইতিহাসের সন্তান এবং এই বৈচিত্রময় মহাবিশ্বের বিস্তীর্ণ পরিসরে আমাদের নিজের পথ নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে - এই মহাবিশ্ব আমাদের দুঃখ বেদনার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন আর তাই আমরা আমাদের সমৃদ্ধির কিংবা পতনের ব্যাপারে সম্পুর্ণভাবে স্বাধীন। আমরা কোন পথ বেছে নেব তার উপরই নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধি বা পতনের সম্ভাবনা।'

বিবর্তনবাদ এক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। গত পাঁচশ বছরে হাজার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হলেও মাত্র দু'টি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বা paradigm shift এ ভুমিকা রেখেছে। এর প্রথমটি হচ্ছে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব এবং আরেকটি হচ্ছে ডারউনের দেওয়া এই বিবর্তনবাদ। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি এবং প্রাণ সংক্রান্ত সব বিজ্ঞানের বুনিয়াদ বিবর্তন তত্ত্ব। আপনি আপনার চারপাশের সব কিছুকে অনড়, স্থির এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে দেখবেন নাকি তার সদা গতিময় বিবর্তনের সাথী হয়ে মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়। বিজ্ঞান কি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছে, না দেয় নি। আমরা এখনও জানি না অনেক কিছুই, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে বিরতিহীনভাবে সামনের দিকে। কিন্তু এই অজানাকে জানার জন্য, তাকে বোঝার জন্য স্থবির নয় বরং প্রয়োজন খোলা মনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। সমাজের বহুদিনের চিন্তার অচলায়তন ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসাটা আমার, আপনার, আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মের জন্যই তা প্রয়োজন। যুগে যুগে এভাবেই এগিয়েছে আমাদের মানব সভ্যতা; ক্রমাগত পরিবর্তন, স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং পুরোনকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় দীক্ষিত হয়ে নতুনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে।

তথ্যসুত্রঃ

১. Pinker, S. Evolution Of Mind, 2003, pbs.org
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/07/2/l_072_03.html

২) Wong, K. Dec 2006 edition, Lucy's Baby, Scientific American Magazine

৩) Sloan, C. Nov 2006 edition, Meet the Dikika Baby, National Geographic Magazine.

৪) Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.

৫) Mayr E, 2004, What Evolution Is, Basic Books, NY, USA

৬) Early Human Phylogeny Tree, Smithsonian National Museum of Natural History
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/a_tree.html

৭) Stringer, C and Andrews, P, 2005, The complete Wrold of Human Evolution, Thames and Hudson Ltd, London.

পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির একাদশ অধ্যায়।}